গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস উদ্ভবের মূলে রয়েছে ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় নবজাগরনের ফলে বাংলাসাহিত্যের গতানুগতিক ধারায় পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই শতকেই বাংলা সাহিত্য নতুন নতুন ধারায় নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলে। কথাসাহিত্য অর্থাৎ উপন্যাস ও ছোটগল্প তার মধ্যে অন্যতম ধারা। উনবিংশ শতকের পূর্বে রচিত নানা সাহিত্যধারায় উপন্যাসের বীজ নিহিত থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা উপন্যাস সার্থক রূপ পরিগ্রহ করে। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির জীবনকে তিনি মননশীল সাহিত্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনক্ষেত্রে স্থাপন করে নতুন প্রাণবাণীতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল— 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪) ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাসে তিনি নব আঙ্গিক নির্মাণ করেন। উপন্যাসে কেবল ঘটনা পরম্পরা বিবরণ দেওয়া নয়, তা বিশ্লেষণ করে চরিত্রের আঁতের কথা বের করে আনা আমরা রবীন্দ্র-উপন্যাসের লক্ষ্য করি। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল , 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'গোরা' (১৯০৯), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'শেষের কবিতা' (১৯৩০) ইত্যাদি। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্র সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাস রচনায় স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি পরিচিত সমাজ ও মানুষের কাহিনী নিপুনভাবে বলেছেন রচনারীতির মাধুর্যে ও ভাষার সারল্যে। 'বিরাজবৌ' (১৯১৪), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'গৃহদাহ' (১৯২০) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। দুই বিশ্বযুদ্ধের ফলস্বরূপ মধ্যবিত্ত সমাজে দেখা গিয়েছিল তীব্র

আর্থিক সংকট, বেকারত্ব, বিশ্বাসহীনতা, মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের ভাঙন। এই সময়ে নারী ঔপন্যাসিক হিসাবে অনুরুপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতা দেবী শান্তা দেবী, গিরিবালা দেবী প্রমুখ শক্তিশালী মহিলা ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার এই সময়েই ১৯২৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল লেখক-গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করেন। এই সময় যেমন প্রেমেন্দ মিত্র, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, মনীশ ঘটক প্রমুখেরা প্রখর বাস্তবতাকে তাঁদের লেখনীতে তুলে ধরেছেন মননশীল ভঙ্গীতে, তেমনি গ্রামীণ বাংলার সহজ-সরল রূপ, সাধারণ মানুষ ও মানুষের অভ্যন্তরীণ মননের টানাপোড়েনকে নতুন ভাবে তুলে ধরেছেন বিভূ তিভূ ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের লেখনীতে।

বিংশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের পটভূ মিতে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম। এই সময়কার লেখকদের মধ্যে আমরা পেয়েছি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, সতীনাথ ভাদুড়ী, সুবোধ ঘোষ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু প্রমুখের লেখা গল্প ও উপন্যাস। যেখানে আমরা সেই অস্থির সময়কে লক্ষ্য করি। সমকালীন সমাজের অবক্ষয় ও মূল্যবোধের বিপর্যয় নিয়ে উপন্যাস রচনা করেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সন্তোষ কুমার ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ ঔপন্যাসিক। অন্যদিকে ১৯৪৬-এর দাঙ্গা এবং ১৯৪৭-এর দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা সব মিলিয়ে বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত জীবন নিজের পরিচিত জগৎ ও জীবনের সীমা ছাড়িয়ে দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি টান অনুভব করে। আঞ্চলিক জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭), প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী (১৯৫৭)', মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল' (১৯৫১), সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৫৭), অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম' (১৯৪৯), অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) ইত্যাদি।

বিশ শতকের চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে নারী ঔপন্যাসিক হিসেবে আবির্ভূ ত হন আশালতা সিংহ, জ্যোতির্ময়ী দেবি, আশাপূর্না দেবী, প্রতিভা বসু, কবিতা সিংহ, মহাশ্বেতা

দেবী, বাণী রায়, লীলা মজুমদার প্রমুখ। ষাট-সত্তরের দশকে একদিকে বামপন্থী আন্দোলন এবং অন্যদিকে নকশাল আন্দোলন উপন্যাসে এক আলাদা মাত্রা যোগ করে। এই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন আশাপূর্ণা দেবী এবং মহাশ্বেতা দেবী। নারী সাহিত্যিকদের হাত ধরে নারী চরিত্র এক নতুন পথের সন্ধান লাভ করে। বিংশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকে এবং আশি-নব্বইয়ের দশকের উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকরা হলেন, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, কমলকুমার মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রমুখের উপন্যাসে ব্যক্তিমনের ক্রমনিজ্জমান অসহায়তা ও জর্জরিত সমাজের ছবি চিত্রিত হয়েছে। এই সময়ে আমরা নারী ঔপন্যাসিক হিসেবে পেয়ে যাচ্ছি সুচিত্রা ভট্টাচার্যকে। তাঁর 'কাঁচের দেওয়াল' (২০১৫), 'হেমন্তের পাখি' (১৯৯৭), 'দহন' (১৯৯৬), 'কাছের মানুষ' (২০১৪) প্রভৃতি এই সময়ের রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এই প্রেক্ষাপটেই নিজের লেখনীর মাধ্যমে উপন্যাস জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন বাণী বসু। আশির দশক থেকেই বাণী বসু বাংলা ভাষার অগণিত সাহিত্যপ্রেমী পাঠককে তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে শুধু মুগ্ধই করেননি, করেছেন নববোধে উন্নীত। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাতায়াতের মাধ্যমে তিনি নিজেকে কখনই একই গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখেননি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির ভিন্নতা আমাদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। বিভিন্ন সময়ে দাঁড়িয়ে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোর মধ্য দিয়ে চলার সময়ে নারী কিভাবে নিজের অবস্থান ও আত্মপরিচয় খুঁজে চলেছে তা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করাই আমাদের গবেষণ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

এক্ষেত্রে আমরা সমগ্র বিষয়টিকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি—

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় : ঔপন্যাসিক বাণী বসুর জীবন সংক্ষেপ ও সাহিত্য পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাণী বসুর উপন্যাসের প্রাথমিক পরিচয় ও বিষয়তগত শ্রেণীকরণ।

তৃতীয় অধ্যায় : বাণী বসুর আধুনিক সময়ের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসে নারীর আত্ম-অনুসন্ধান।

চতুর্থ অধ্যায় : বাণী বসুর পুরাণ মহাকাব্য নির্ভর উপন্যাসে নারীর আত্ম-অনুসন্ধান।
পঞ্চম অধ্যায় : বাণী বসুর ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে নারীর আত্ম-অনুসন্ধান।
উপসংহার :

ভূমিকা

বাণী বসু বাংলা উপন্যাস জগতের এক প্রভূত জনপ্রিয়তার অধিকারিণী কথাসাহিত্যিক। বাণী বসু তাঁর উপন্যাসে মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনকে গভীর ও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন। বিশ শতকের আশির দশক থেকে লিখিত তাঁর একের পর এক উপন্যাস পাঠক মহলে বিপুল সমাদৃত হয়েছে। বাণী বসুর উপন্যাসের নারী চরিত্ররা জীবনকে দেখার চেষ্টা করেছে নানা স্বর-বিন্যাসে। নারী চরিত্র গুলিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন নিজস্ব অনুভুতি ও সংবেদনশীলতার মধ্য দিয়ে। তা বর্তমান-পুরাণ- ইতিহাস যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই হোক, নিম্ন স্তরের কিংবা উচ্চ স্তরের হোক , সবার কথাই তিনি তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বাণী বসুর উপন্যাসে নারীর এই আত্ম-অনুসন্ধানই আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ঔপন্যাসিক বাণী বসুর জীবন সংক্ষেপ ও সাহিত্য পরিচয়

যেকোন সাহিত্যিকের শিল্পসৃষ্টির মূলে গভীর ভূ মিকা পালন করে সাহিত্যিকের বড় হয়ে ওঠার পরিবেশ, ব্যক্তিগত জীবন। তাই কোন সাহিত্যিকের সৃষ্টিকে যথাযথভাবে জানতে হলে তাঁর ব্যক্তিক জীবনকে জানা প্রয়োজন। সেই লক্ষেই বাণী বসুর জীবন সংক্ষেপ ও তাঁর সাহিত্য পরিচয় এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হবে। বাণী বসু ১৯১৩ সালের ১১ই মার্চ উত্তর কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন কলকাতাতেই কেটেছে। বাণী বসু ছাত্র জীবন থেকেই নানা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, অনুবাদ কর্মে তাঁর পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প ‘বজ্রপাতের পরে’। গল্পটি ১৯৮১ সালে

প্রথমে ‘আনন্দমেলা’ ও পরে ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘জন্মভূমি মাতৃভূমি’ ১৯৮৭ সালে শারদীয় ‘আনন্দলোক’-এ প্রকাশিত হয়। বাণী বসুর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে, ‘জন্মভূমি মাতৃভূমি’, ‘অন্তর্ঘাত’, ‘পঞ্চম পুরুষ’, ‘অমৃতা’, ‘উত্তরসাধক’, ‘গান্ধর্বী’, ‘শ্বেতপাথরের থালা’, ‘একুশে পা’, ‘বৃত্তের বাইরে’, ‘রাধানগর’, ‘খারাপ ছেলে’, ‘মৈত্রেয় জাতক’, ‘অষ্টম গর্ভ’ (২খণ্ডে), ‘খনামিহিরের ঢিপি’, ‘অশ্বযোনি’, ‘ঝড়ের খেয়া’, ‘তিমির বিদায়’, ‘ক্ষত্রবধূ’, ‘কালিন্দী’, ‘পাঞ্চালকন্যা কৃষ্ণা’ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাণী বসুর উপন্যাসের প্রাথমিক পরিচয় ও বিষয়তগত শ্রেণীকরণ

কালে কালে জীবনের রঙ বদলে যায়, পরিবর্তন হয় জীবনবোধের। এই পরিবর্তনই রুপান্তরিত হয় সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে। বাণী বসুর এই উপন্যাসগুলির মধ্যেও রয়েছে জীবনবোধের এই পরিবর্তন। তিনি তাঁর উপন্যাসের মধ্যে বিষয়গত বৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন তার নিজস্ব স্টাইলে। চরিত্র চিত্রণেও তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজের নানা কাঠামোর মধ্যে, নানা পরিস্থিতিতে নারী যে নিজের সত্ত্বাকে নিরন্তর খুঁজে চলেছে তা তিনি তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বাণী বসুর উপন্যাসে নারীর আত্ম-অনুসন্ধানকে আমরা বিষয়গত দিক থেকে তিনভাবে শ্রেণীকরণ করতে পারি—

ক) বাণী বসুর আধুনিক সময়ের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসে নারীর আত্ম-অনুসন্ধান।

খ) বাণী বসুর পুরাণ-মহাকাব্য নির্ভর উপন্যাসে নারীর আত্ম-অনুসন্ধান।

গ) বাণী বসুর ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে নারীর আত্ম-অনুসন্ধান।

এই তিনটি পর্যায় কোন কোন উপন্যাসে রয়েছে এবং সেই উপন্যাসগুলির প্রাথমিক পরিচয় এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করব। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে নারীর নিজস্ব সত্ত্বাকে চেনার যে পথ তিনি দেখিয়েছেন তাও এই অধ্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
বাণী বসুর আধুনিক সময়ের পটভূমিতে রচিত নারীর আত্ম-অনুসন্ধান

বাণী বসু তাঁর আধুনিক সময়ের উপন্যাসে বিভিন্ন পরিবেশ থেকে উঠে আসা নারী চরিত্রগুলোকে বাস্তবসম্মত ভাবে তুলে ধরেছেন। আধুনিক সমাজে নারীর অবস্থান ও তাঁর আত্ম-অনুসন্ধানকে তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন 'অমৃতা', 'শ্বেতপাথরের থালা', 'উত্তরসাধক', 'খারাপ ছেলে', 'বৃত্তের বাইরে', 'একুশে পা' ইত্যাদি উপন্যাসে। 'অমৃতা' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই জীবনের জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও অমৃতা, শম্পা, লাবনী, জয়িতা, দোলা— এদের প্রতিবাদী ও দৃঢ়চেতা হয়ে ওঠার কাহিনী। 'খনামিহিরের ঢিপি' উপন্যাসে দেখা যায় একই পরিসরে মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে নারীর অবস্থানগত ভিত্তি। তাই একজন নারী সাহিত্যিক হিসেবে নারীর প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং আত্ম-অনুসন্ধানকে তিনি কীভাবে তাঁর আধুনিক সময়ের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন তা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়
বাণী বসুর পুরাণ মহাকাব্য নির্ভর উপন্যাসে নারীর আত্ম-অনুসন্ধান

বাণী বসু ভারতীয় পুরাণ তথা মহাকাব্যকে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর পুরাণভিত্তিক উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'অষ্টম গর্ভ', 'কালিন্দী', 'ক্ষত্রবধূ', 'পাঞ্চালকন্যা কৃষ্ণা', 'ক্ষত্তা' প্রভৃতি। উপন্যাসগুলিতে বাণী বসু পুরাণের কাহিনীর মধ্যে নিজস্ব কল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে কাহিনীর মধ্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। প্রতিটি নারী চরিত্রই লেখিকার কল্পনা বলে নতুনত্ব লাভ করেছে। 'কালিন্দী' উপন্যাসে এক ধীবর কন্যার মহারাণী হয়ে ওঠা, 'ক্ষত্রবধূ' উপন্যাসে গান্ধারী-কুন্তী-মাদ্রী তিন রাজবধূর রাজনীতির আবর্তে নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের অকাল মৃত্যু,

‘পাঞ্চালকন্যা কৃষ্ণা’ উপন্যাসে কৃষ্ণার স্বামী-সংসার নিয়ে আবাল্যলালিত স্বপ্নে চুরমার হয়ে যাওয়া, ‘ক্ষত্তা’ উপন্যাসে সত্যবতীর পাশাপাশি অম্বিকা-অম্বালিকার প্রতি ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সমস্ত কিছুই বাণী বসু তাঁর পুরাণ মহাকাব্য ভিত্তিক উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

বাণী বসুর ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে নারীর আত্ম-অনুসন্ধান

বাণী বসু ভারত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়কে তুলে ধরেছেন তাঁর ‘মৈত্রেয় জাতক’ উপন্যাসে। ইতিহাসের চরিত্র শাক্যবংশের গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে রচিত এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক সময়ের পাশাপাশি সময়াতীত মানব মনের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, সাফল্য-বিপর্যয়, সম্পর্কের উত্থান-পতন মনস্তাত্ত্বিক স্তরের মধ্য দিয়ে লেখিকা তুলে ধরেছেন। বাণী বসু ‘মৈত্রেয় জাতক’ উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলির রুদ্ধজীবনের বন্ধন মুক্তি কীভাবে ঘটিয়েছেন এবং নারী চরিত্রগুলোর মনের কথাকে কীভাবে উপস্থাপিত করেছেন তা উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলো আলোচনার মধ্য দিয়ে এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহার

পূর্বের অধ্যায়গুলি থেকে যে তথ্য বা আলোচনার নির্যাস আমরা পেয়েছি তার উপর ভিত্তি করেই উপসংহার আলোচিত হয়েছে।